লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অবদান ঃ প্রাচীন কাল

আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান *

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবদান থাকলেও সুলিখিত ও সুগ্রথিত প্রমাণপঞ্জীর অভাবে বর্তমান-কালে তা পর্যালোচনা করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রাক-বৈদিক যুগ সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া সম্ভব হয়নি। বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ নিয়ে পর্যালোচনার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদান সম্পর্কে বিস্তর অগ্রথিত তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু দুটি মূল কারণে এই তথ্য প্রমাণাদি সম্পূর্ণ আকারে পেশ করা সম্ভব হয়না। প্রথমত, ভারতের প্রাচ্য অঞ্চল তথা বাংলাদেশের সেকালে নিজস্ব কোন ভাষালিপি ছিলনা। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবদান থাকলেও তা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, বেশীর ভাগ তথ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন দেশের তৎকালীন পরিব্রাজকদের গ্রন্থ থেকে। বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখায় অত্যন্ত সংগত কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও বর্ণনা বিধৃত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতামতও ব্যক্ত হয়েছে। সে সমস্ত মতামত ও তথ্য একসূত্রে গ্রথিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক তথ্যই বর্জন করতে হয় এবং কিছুটা ভ্রান্তির অবকাশও থেকে যায়।

১.২ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর প্রাচীন কালীন অবদান বিশ্লেষণের প্রারম্ভে সে কালের বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা প্রয়োজনীয়।

২.১ বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাষা

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও বৈয়াকরণদের মতে বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাষা 'অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা' যা মন্‌খ্‌মের ভাষা পরিবার ও কোলমুন্ডা ভাষা পরিবারের ঘনিষ্ঠতর ছিল। এর সাথে যুক্ত হয় দ্রাবিড় ভাষা। এ ছাড়া 'ভোট ব্রহ্ম' ও 'কিরাতজন'দের ভাষাও এই ভাষার সাথে সংমিশ্রিত হয়। উপর্যুক্ত ভাষাগুলোর সব ক'টি মূলত অনার্য ভাষা ছিল। কালক্রমে মধ্য ও উত্তর ভারত থেকে নানা-ধর্মী যতি (মুনি) সন্যাসী, বণিক, সার্থবাহ (বণিকদের পথ প্রদর্শক), সৈনিক ও রাজপুরুষের আগমনের ফলে অনার্যদের

---

* ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণের সাথে সাথে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। পরবর্তীকালে যদিও প্রাচ্য (বাংলাদেশ) অঞ্চলে মাগধী ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের মাঝে প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাজ কার্যে সংস্কৃতই মূলভাষা রূপে বহুকাল বিদ্যমান থাকে। সংস্কৃতকে তখন কুলীন ও বিজ্ঞজনদের ভাষারূপে অভিহিত করা হতো। তৎকালীন বাঙ্গালী পন্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষাকে ভালরূপে আত্মস্থ করতে সক্ষম হননি। এর ফলেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালী পন্ডিতগণ কোন গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেননি।

২.২ ৮০০-১১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি ভাষা সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল। সেগুলো হলো-সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সর্বদা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো। পন্ডিতগণ কথোপকথনে প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করতেন-তবে তার বাচনভঙ্গী ছিল কুণ্ঠিত। প্রাকৃত ভাষায় কোন সাহিত্য গড়ে উঠেনি। তবে বৌদ্ধদের রচনায় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র-সংস্কৃত ভাষা দেখা যায়। এই ভাষাকে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' ও বলা হয়ে থাকে। শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতে কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা তাদের দোহাগুলো রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে মৈথিল কবি 'বিদ্যাপতি' এই শৌরসেনী ভাষায় 'কীর্তিলতা' কাব্য রচনা করেন। নবম শতকের পর শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশ ভাষা প্রায় পাশাপাশি ভাষারূপে বিবেচিত হতো। মাগধী অপভ্রংশ ভাষা বিবর্তিত হয়ে প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলার চর্যাগীতিগুলো এই ভাষায় রচিত হয়।

৩.০ বঙ্গ ভূমির সীমারেখা

প্রাচীন বাংলাভূমির রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা একত্রিত করে সমগ্র বাংলা রূপে চিহ্নিত করা সম্ভবপর, প্রাচীনকালে বঙ্গভূমির সেরূপ কোন সীমরেখা ছিলনা। বর্তমানের বঙ্গভূমি প্রাচীনকালে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাবলীর সমাহার ছিল। তখনকার দিনে মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ এই অঞ্চলকে 'প্রাচ্য অঞ্চল' বলে অভিহিত করতো এবং 'অস্পৃশ্য জাতির বসবাস এলাকা' বলে বিশ্বাস করতো। তাদের ঘৃণাবোধ এতদুর বিস্তৃত ছিল যে, কেউ এদেশ ভ্রমণ করে উত্তর বা মধ্য ভারতে ফিরে গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। বঙ্গভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সীমানা কখনও নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন রাজশক্তির জয় পরাজয়ে রাজ্যের সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী মানুষের কথ্য-ভাষার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল, তবে তাদের সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে মোটামুটি একটা সাযুজ্য বিরাজমান ছিল।

৪.০ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্জীর উৎস

৪.১ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলার মানুষদের কোন ভাষা লিপি ছিলনা এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত তারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনায় সক্ষম

হয়নি। তবে খৃষ্টপূর্ব আমলে এবং ষষ্ঠ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে বঙ্গদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল; এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাকৃত, মাগধী, পালি প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন এলাকায় টোল, বিহার, আশ্রম নামক বিদ্যাপিঠগুলোতে শিক্ষাদান প্রথা চালু ছিল।

৪.২ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীসের দার্শনিক ও ভূগোলবিদ টলেমী এদেশ পরিভ্রমণে আসেন এবং গঙ্গার পূর্ব তীরের অধিবাসীদের (তৎকালীন মুরন্ড জাতি) সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তাঁর 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে পরিবেশন করেন। পঞ্চম ও সপ্তম শতকে ফাহিয়েন ও হিউ এন সাঙ নামক চীনা পরিব্রাজক বঙ্গদেশে শিক্ষালাভ ও পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তাঁদের গ্রন্থাবলী থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাবলী পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া গেছে তিব্বত ও নেপাল রাজ দরবার থেকে। তিব্বতের 'তিব্বতী গ্রন্থ তালিকা', লামা তারনাথ রচিত 'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস', সুম্পা রচিত 'পাগ-সাম্-জোন-জাং' এবং 'লামা বুতান' রচিত 'ত্যাংগুর' গ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অবদানের বহু তথ্য পাওয়া গেছে। নেপালের রাজ দরবার থেকে 'চর্যাগীতি' নামক যে কাব্য সংকলনটি পাওয়া গেছে, তা তৎকালীন বাঙ্গালীর আদি বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়।

৪.৩ এছাড়া তা-চেং-টেং নামক একজন চীনা ছাত্র তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারে ১২ বছর শিক্ষা লাভ করে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। 'নাগার্জুন বোধিসত্ত সুহৃল্লেখ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। মুলত উপর্যুক্ত তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী থেকেই প্রাচীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-চর্চা ও অবদান আলোচিত হয়ে থাকে।

৫.০ প্রাচীন তথ্যপঞ্জী বিশ্লেষণের সমস্যা

৫.১ প্রাচীন তথ্যপঞ্জীর বেশীর ভাগ যেহেতু তিব্বতী ভাষায় রচিত, তাই সে আমলের বাংলাদেশের স্থান ও লেখকের নাম সনাক্ত করা যথেষ্ট কষ্টকর বিবেচিত হয়। যেমন, প্রাচীন গ্রন্থকারদের ঠিকানায় 'জাহোর' ও 'সাহোর' নগরের নাম দুটি উল্লিখিত রয়েছে। এ দুটি ঠিকানাকে কোন কোন ঐতিহাসিক একটি ঠিকানা বলে প্রমাণ করেছেন এবং স্থান হিসেবে 'যশোহর' এলাকাকে নির্ধারণ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক সাহোর বলতে বর্তমান ঢাকা জেলার সাভার এলাকাকে সনাক্ত করেন। অনেকে আবার জাহোর/সাহোর বলতে পাকিস্তানের 'লাহোর' এলাকাকে নির্দিষ্ট করেন। ঠিক এমনিভাবে 'উড্ডিয়ানা' নামক স্থানটিকে সনাক্ত করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কেউ একে উড়িষ্যা এলাকা, কেউ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এলাকা এবং কেউ পুন্ড্রবর্ধনের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য (বাংলাদেশের) বলে সনাক্ত করেন।

৫.২ অন্যদিকে প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রবিদ 'নাগবোধি'কে কেউ উত্তর প্রদেশের লোক মনে করেন, আবার অন্যরা তাকে বাঙ্গালী বলে দাবী করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার

'শান্তরক্ষিত' কে কেউ কেউ মধ্য ভারতের অধিবাসী মনে করেন। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক তাকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করেছেন।

৫.৩ তথ্যপঞ্জীর বিশ্লেষণে এরূপ সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও অন্যান্য অবস্থার সাথে সংগতি রেখে বাঙ্গালীর নাম ও স্থানের নামের সনাক্তিকরণ করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের মতামতকে এই আলোচনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৬.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সম্প্রদায়গত অবদান

৬.১ প্রাচীন বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান বিশ্লেষণে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথেষ্ট কীর্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে প্রাচ্য অঞ্চলীয় তথা বঙ্গভূমির হিন্দুগণ অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ছিল বলে সংস্কৃত ভাষা অধিকার ও প্রয়োগ ক্ষমতা তাদের বিশেষ একটা ছিলনা। উত্তর ও মধ্য ভারতীয় কুলীন হিন্দুগণ সর্বদায় এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো এবং বিদ্যা চর্চার অধিকার সীমিত রাখার প্রচেষ্টা চালাতো। ধর্মীয় গুরু হিসেবে বিবেচিত খুবই কম সংখ্যক জনগণের একটা শ্রেণী বিদ্যাচর্চায় রত ছিল।

৬.২ বৌদ্ধ আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি বৌদ্ধ রাজাগণ বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করে। বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত মহাবিহারগুলোতে বিদ্যাচর্চার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। তৎকালীন বৌদ্ধ মহাবিহারগুলোর প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে বাংলার পাল রাজাগণ সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছে। বিখ্যাত মহাবিহারগুলোর মধ্যে নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল বাদে বাকী সবগুলোই বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল। উল্লেখযোগ্য বিহারগুলোর নাম হচ্ছে ঃ জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পন্ডিত, পট্টিকেরক, প্রভৃতি।

৬.৩ মধ্যযুগের পূর্বে যেহেতু মুসলিমগণ এদেশে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেনি এবং এই ধর্মানুসারীদের অবস্থিতি ছিল না, তাই প্রাচীন কালীন বর্ণনায় তাদের আমল সম্পর্কে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়।

৭.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদান

৭.১ প্রাচীনকাল হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মগুরুদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান ছিল, তবে বৌদ্ধদের আমলে 'বিহার' সৃষ্টি পদ্ধতিতে তারাই সর্ব প্রথম বঙ্গদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সংগঠিত ও সবার জন্য উন্মুক্তভাবে আরম্ভ করে। হিউ-এন-সাঙ প্রমাণ করেন যে, বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রই পঠিত হতোনা, বরঞ্চ ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত, চিত্রকলা, মহাযান-শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগ-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ও অধিতব্য ছিল। প্রতিটি বিষয়ের পন্ডিত ও গ্রন্থ সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

৭.২ ব্যাকরণ শাস্ত্র ঃ চন্দ্রগোমী নামক একজন পন্ডিতের 'চান্দ্র ব্যাকরণ' গ্রন্থ তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে এর প্রভূত প্রচলন হয়। তবে তত্ত্ব ও রীতির অভাবে এই ব্যাকরণ স্থায়িত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগোমীর জন্মস্থান ছিল বরেন্দ্রীতে এবং পরে তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হয়ে চন্দ্রদ্বীপে আবাস নির্মাণ করেন। তিনি সপ্তম শতকে বা তারও আগে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি তর্কবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন এবং 'ন্যায় সিদ্ধালোক' নামে তর্ক শাস্ত্র সৃষ্টি করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের 'বজ্রযান' বিষয়ক ৩৬ টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

৭.৩ দর্শন ঃ সপ্তম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে 'গৌড়পাদ কারিকা' নামে ২১৫টি শ্লোক বিশিষ্ট একটি দর্শন শাস্ত্র জনৈক 'গৌড়পাদ' কর্তৃক প্রণীত হয় যিনি গৌড় রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। মুসলিম পরিব্রাজক আল-বিরুনী জনৈক গৌড় সন্যাসীর একটি 'সাংখ্য কারিকা'র কথা উল্লেখ করেছেন, অনেক ঐতিহাসিক ঐ সন্যাসী হিসেবে গৌড়পাদকেই সনাক্ত করেছেন। এই দর্শন ছিল প্রাক-শংকর বৈদান্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সুক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও সাংগীকরণ।

শ্রীধর ভট্ট নামক অপর একজন লেখক 'ন্যায় কন্দলী' নামে একটি দর্শন ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচনা করেন-যা সর্ব ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে। ৯১৩ সালে এটি রচিত হয়। তার অন্যান্য আরও গ্রন্থ ছিল-যা কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে।

৭.৪ হস্তী আয়ুর্বেদ বিদ্যা ঃ প্রাচীনকালে বাংলাদেশে প্রচুর বন-জংগল থাকায় হাতীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। রাজা ও শাসকগণ যানবাহন হিসেবে ও যুদ্ধ বিগ্রহে হাতী ব্যবহার করতেন। অনেক সময় হাতী মালামাল পরিবহনে বাণিজ্যিক বাহন হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। হাতীর চিকিৎসার্থে সে আমলে 'হস্তায়ূর্বেদ' বা 'গজ চিকিৎসা গ্রন্থ' রচিত হয়। জনৈক 'পালকাপ্প' নামক হস্তী চিকিৎসকের কথোপকথন থেকে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল (চম্পার রাজা রোমপাদের সাথে পালকাপ্পের কথোপথন)। অনেকে অবশ্য উপর্যুক্ত মতামত অস্বীকার করেন এবং গ্রন্থটি পালকাপ্পের কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেননা, দ্রাবিড় ভাষায় পাল ও কপি-দুটোর অর্থই হাতী। তবে গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং সেটি একাদশ শতকের পূর্বে রচিত তার প্রমাণও রয়েছে। অন্যান্য প্রমাণাদি থেকে বলা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই হস্তী চিকিৎসার একটা ঐতিহ্য বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল এবং কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

৭.৫ যোগশাস্ত্র ঃ গৌড় নিবাসী অভিনন্দ 'যোগ্যব্যশিষ্ঠ সংক্ষেপ' নামে একটি যোগ শাস্ত্র রচনা করেন। গ্রন্থটি ৬ প্রকরণ ও ৪৬ সর্গে বিভক্ত। তিনি ন্যায় শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন।

৭.৬ চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ চক্রপাণি দত্ত নামক সর্ব ভারতীয় রোগ নিদানবিদ ছিলেন গৌড় রাজ্যের কর্মচারী নারায়নের পুত্র। চক্রপাণির এক ভাই ভানু ছিলেন রোগ নিদান

শাস্ত্রে সুপন্ডিত ও সুচিকিৎসক। চক্রপাণি রচিত 'আয়ুর্বেদ দিপীকা, শব্দ চন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' গ্রন্থ ত্রয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থটি ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৭.৭ **জ্যোতিষ শাস্ত্র ঃ** জনৈক কল্যাণ বর্মা নামক বাঙ্গালীর রচিত 'সারাবলী' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ। মুসলিম পরিব্রাজক আল-বিরুনী এই গ্রন্থের বহু বচন ও শ্লোক উদ্ধার এবং প্রকাশ করেছিলেন।

৭.৮ **রসায়ন শাস্ত্রঃ** রসায়নাচার্য নাগার্জুনের প্রধান সহায়ক ছিলেন 'নাগবোধি'। নাগবোধিকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করেছেন। নাগার্জুন যখন পুন্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণা করতেন, তখন নাগবোধি প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে নাগবোধি ১৩ খানা রসায়ন শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

৭.৯ **ধর্ম শাস্ত্র ঃ** একাদশ শতকে জিতেন্দ্রীয় ও বালক নামক ব্যক্তিদ্বয় ধর্মশাস্ত্র রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের কোন রচনা বর্তমানকালে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের রচনাগুলো পরবর্তীকালে জীমুতবাহন, শুল পাণি, রঘুনন্দন, প্রমুখ বাঙ্গালী পন্ডিতগণ পর্যালোচনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, একাদশ শতকে গ্রন্থকারদ্বয়ের রচনা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এছাড়া বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিস্তর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উক্ত ধর্ম প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ প্রণেতাই ছিলেন বাঙ্গালী। এঁদের রচিত মহাযান, বজ্রযান, কালচক্র যান, সহজযান, নাথ ধর্ম, কোল ধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলি সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৭.১০ **সাহিত্য (কাব্যচর্চা) ঃ** সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলাদেশে সাহিত্য চর্চায় দু'প্রকারের রীতির বিদ্যমানতা দেখা যায়। রীতি দুটির নাম ছিল বৈদভী ও গৌড়ী। বৈদভী রীতিতে 'দন্ডী' নামক কবি প্রধানত কাব্য চর্চা করেছেন। গৌড়ী রীতিতে কাব্য চর্চা করেন ' ভামহ' নামক কবি। কালক্রমে দশম ও একাদশ শতকে গৌড়ী রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গৌড়ী রীতি তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

গৌড়ীয় জনগণ গৌড়ী রীতিতে কাব্য চর্চাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ ও পালনে সচেষ্ট হয় এবং মধ্য ভারতীয় রাষ্ট্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। রাজা শশাংকের আমলে এসে গৌড় রাষ্ট্র-চেতনা পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী রাজাগণ গৌড়সহ অন্যান্য রাজ্যের অধিপতি হয়েও নিজেদেরকে 'গৌড়াধিপতি' বলে পরিচয় দিতেন।

৭.১১ **কাব্য সংকলন ঃ** নেপালে একাদশ-দ্বাদশ শতকে রচিত একটি কাব্য সংকলন পাওয়া গেছে, যার নাম 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'। এতে সংকলয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটিতে ১১১জন কবির মোট ৫২৫টি শ্লোক আছে। তারমধ্যে

কালীদাস, অমরু, ভবভুতি, রাজশেখর প্রমুখ কতিপয় অবাঙ্গালী কবির কবিতাও রয়েছে।

বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে অভিনন্দ, ডিম্বক, কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকর গুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, ললিতক, বিণয়দেব, ছিত্তপ, বন্দ, তথাগত, জয়ীক, শুভংকর, শ্রীধর নন্দী, রতিপাল, সোনোক, অপরাজিত, রক্ষিত, প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় এ ধরনের কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন বাংলাদেশেই প্রথম সৃষ্টি করা হয়। এর পরের কাব্য সংকলন পর্বের নাম 'সদুক্তি কর্ণামৃত'। এর সংকলয়িতা কে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদগণ সংকলয়িতাকে একজন বাঙ্গালী হিসেবে ধারণা করেন।

নবম-দশম শতকে প্রণীত আরেকটি কাব্য গ্রন্ত বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষভাবে গর্বের বস্তু, যার নাম 'চর্যাগীতি'। এটি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত। এই ভাষাকে অনেক ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণ 'আলো আঁধারী ভাষা' বলে উল্লেখ করেন। মাগ্‌ধী অপভ্রংশ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রবেশের সন্ধিক্ষণে উক্ত গ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত। এর অনেক শব্দ বর্তমান বাংলা ভাষায় বিদ্যমান নেই। কাব্য গ্রন্থটি নেপালের রাজ দরবার থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চর্যাগীতির লেখকগণের অধিকাংশই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিদের নাম শান্তিপাদ, সরোরহ বজ্র, কুক্কুরী পাদ, শবরী পাদ। কুক্কুরী পাদের দুটি কবিতা (চর্যাগীতি ও চর্যা বিনিশ্চয়) এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সে আমলের অন্যান্য অনেক কবির কবিতা চর্যাগীতিতে সংকলিত হয়েছে।

৮.০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে প্রাচীন বাঙ্গালী মনীষী

৮.১ মহাচার্য শীল ভদ্র ঃ নালন্দা মহা বিহারের মহাচার্য শীল ভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজ বংশের সন্তান এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং এর গুরু। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারে দেশ বিদেশের ১০ হাজার ছাত্র (শ্রমন) শিক্ষা লাভ করতো। তিনি সে আমলের সকল শাস্ত্রের সুপন্ডিত ছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের সকলে তাকে 'সদ্ধর্মের ভান্ডার' বলে সম্ভাষণ করতো।

৮.২ শান্ত রক্ষিত ঃ শান্ত রক্ষিত ছিলেন সাহোর (?) রাজবংশের সন্তান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের তিন বা সাতখানা তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতের তৎকালীন রাজা 'ঘ্রিসংলদেব্যসান' এর আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যান। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যর্থ হয়ে নেপাল ফিরে আসেন। পরে আবার আমন্ত্রিত হয়ে সাথী 'পদ্ম সমভব'কে নিয়ে তিব্বত গমন করেন এবং তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। রাজা খুশী হয়ে 'বসময়া' নামক একটি বিহার তিব্বতে প্রতিষ্ঠা করে শান্তরক্ষিতকে তার প্রথম সংঘাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেন। শান্তরক্ষিত বাকী জীবন সেই বিহার পরিচালনা করেছিলেন।

৮.৩ দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ঃ একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পন্ডিত অতীশ দীপংকর বাংলাদেশের বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্র যোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন বলে বিক্রমশীল মহাবিহারের

মহাচার্য পদে রাজা মহীপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ ১৩ বছর তিনি তিব্বতে ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি ওদন্তপূরী বিহারেরও আচার্য ছিলেন। ত্যাংগুর গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জীবনে ১৭৫ খানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছিলেন। বাংলাদেশ ও তিব্বতের মাঝে সেতু বন্ধন রচনায়, চরিত্রে, পান্ডিত্যে, মনীষায় ও আধ্যাত্ম গরীমায় তিনি সে কালের ভারতবর্ষের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিক্রমশীল মহাবিহারের অধিনায়ক রত্নাকর বলেছিলেন, "দীপংকর ছাড়া ভারতবর্ষ অন্ধকার।" সে আমলে কোন বাঙ্গালী ভারতবর্ষে তাঁর মত প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হননি।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত তৎকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ পন্ডিত, লেখক ও অনুবাদকদের মধ্যে বিশিষ্ট বাঙ্গালী ছিলেন জ্ঞানশীমিত্র, অভয়াকরগুপ্ত, দিবাকর চন্দ্র, রত্নাকর শান্তি, কুমার ব্রজ, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞা বর্মা, প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ।

৯.০ উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন আমলে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন সগৌরবে বিদ্যমান ছিল, তেমনি বাঙ্গালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। যদিও সংরক্ষণের অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ কালের স্রোতে অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তথাপি যা আছে বা প্রমাণিত হয়েছে, তা একটি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আজাদ, হুমায়ন *'তুলনামূলক ও ঐতিহাকি ভাষা বিজ্ঞান'* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

২। আশরাফ, কে, এম, *'Life and Condition of the people of Hindustan.*

৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, *"The Origin and Development of the Bengali Language.'* কোলকাতা।

৪। ভাদুরী, জে, সি *'বাংলার সামাজিক ইতিহাস'* কোলকাতা

৫। মজুমদার, আর, সি *'বাংলাদেশের ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩৫২বাং

৬। রায়, নীহার রঞ্জন, *'বাংগালীর ইতিহাস আদিপর্ব (২য় খন্ড)'* কোলকাতা।

৭। রায়, এন *'বাঙ্গালীর ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩৫৯বাং

৮। ডঃ রহিম, এম, এ *'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' (১ম খন্ড)* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী অনুদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৯। সেন, সুকুমার, *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)'* কোলকাতা।

১০। সেন, কে, পি, *'বাংলার ইতিহাস'* কোলকাতা, ১৩০৮ বাং

১১। স্টুয়ার্ট, সি *History of Bengal'* দিল্লী, ১৯৫৯ লন্ডন, ১৯১৩

১২। হালদার, গোপাল, *সংস্কৃতির রূপান্তর,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪

১৩। হালদার, গোপাল 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (আদি ও মধ্যযুগ) মুক্তধারা, ঢাকা,১৯৭৬